রম্যরচনা ও সৈয়দ মুজতবা আলী

রম্যরচনা

রম্যরচনা গদ্যসাহিত্যের এমন এক শাখা যার জন্য প্রয়োজন অসাধারণ সৃষ্টিক্ষমতা। রম্যরচনা বাহ্যিক ভূষণে তেমন ভারিক্কি মনে না হলেও, তার ধার কিন্তু অল্প নয়। তীব্র-তীক্ষ্ম তার শক্তি-ধার। ভারে নয়, ধারে কেটে ফালি ফালি করার ক্ষমতা তার যথেষ্টই রয়েছে। সে হিসেবে রম্যরচনা সৃষ্টি এত সহজ নয়। বরং তার জন্য দরকার দুর্জয় সৃষ্টিক্ষমতা। অনুকারী লেখকের শিথিল কলমে রম্যরচনা হয় না, হয় নির্বোধের প্রলাপ-উক্তি। তাই দেখা যায়, লিখতে না পারার দুর্বলতা থেকেও অনেকে রম্যরচনায় হাত দিয়ে পছন্দ করে না।

প্রবন্ধসাহিত্যের মন্ময় শাখার অন্যতম শ্রেণী হলো রম্যরচনা (Belles-Lettres)। বাংলাসাহিত্যে এ শাখাটির আবির্ভাবের ইতিহাস খুব পুরনো নয়। প্রথম দিকে নাম ডাকাডাকি নিয়েও অস্থিরতা ছিল। হালকা চালের সাহিত্যিক রচনা, ব্যক্তিগত প্রবন্ধ, বিচিত্র প্রবন্ধ, নকশা, খোশমেজাজী গল্প-কথা- এরকম বিভিন্ন নামে ডাকা হত তাকে। অবশ্যি পরে তার পোশাকী নাম স্থির হয় রম্যরচনা। আধুনিক যুগে রম্যরচনা বলতে একধরনের লঘু কল্পনাময় হাস্যরসাত্মক রচনাকে বুঝায়। ব্যক্তিগত প্রবন্ধকেও কেউ কেউ রম্যরচনা অভিহিত করেছেন। যদিও রম্যরচনা ও ব্যক্তিগত প্রবন্ধে পার্থক্যও বিস্তর। শাস্ত্রীয় সংজ্ঞার মারপ্যাঁচে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন একথা মনে রাখা যে, সাহিত্যে কোনো কিছু ভুঁইফোড় নয়। সাহিত্য সতত সঞ্চরণশীল। সময়ের চাকাঘূর্ণনে সাহিত্যের সংজ্ঞা, চিত্র ও চরিত্র পাল্টায়। যুগে যুগে সাহিত্যের সবকিছু ভেঙ্গে-চুরে নতুন হয়, সংস্কারায়িত হয়। শব্দ পাল্টায়, শব্দের অর্থ বদলে যায়। বদলের হাওয়া লাগে বলার ভঙ্গিতে ও সঙ্গীতে। সঙ্গত কারণেই রম্যরচনা এখন শুধু লঘু কল্পনাময় হাস্যরসাত্মক রচনাকেই বুঝায় না। আরো বহুকিছুকে বুঝায়। তবে শর্ত হলো রম্যরচনার স্বভাব ও লক্ষণ সুস্পষ্টভাবে বিদ্যমান থাকতে হবে। সমাজ-কাল-জাতির চলিষ্ণু চালচিত্রের সাহিত্যিক ধারাভাষ্যকেও রম্যরচনা বলে। সেখানে একই সঙ্গে থাকতে পারে হাস্যরস, ব্যঙ্গ ও কৌতুকধর্মিতার ঝাঁজালো রস। বিষয় যাই হোক, রম্য শব্দের আদিতে যে মনোরমতা ও মনোহারিতার ভাব আছে, রম্যরচনায় সেটা থাকতেই হবে। এমনকি চিরতার জিহবাবধ তিক্ততাও সেখানে থাকতে পারে। মধুর মিষ্টতাও থাকেই। তবে মনে রাখতে হবে, রম্যতা যেন চটুলতায় পর্যবসিত না হয়।

পড়ুয়া পাঠকদের নিত্যনৈমিত্তিক ‘পড়ার জন্য’ পড়া তো অতিমাত্রায় স্বাভাবিক ব্যাপার। ভারিক্কি চালের এসব পড়ার মাঝখানে মাঝেমধ্যে কিছু লেখা আমরা পড়ি যেগুলো মনকে বিশ্রাম এনে দেয়; মন খুলে হাসার প্রশান্তি দেয়। শাণিত বুদ্ধির খরদীপ্ততা আর সুতীক্ষ্ণ রসবোধের সংমিশ্রণে লেখা পাঠকমনে এক ধরনের প্রফুল্লতার ছোঁয়া দেয়। তেমন ধারার লেখাই হলো রম্যরচনা।

‘রম্যরচনা’ নামটা হাল আমলের হলেও ‘বেলে লেতরস’ (Belles Lettres) কিন্তু অনেক দিনের। নাম যা-ই হোক, ‘রম্যরচনা’ বাbelles lettres হলো পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিচার-বিশ্লেষণ থেকে দূরবর্তী এক লঘুচালের সৃষ্টিমূলক গদ্যরচনা। এতে কোথাও দেখি খানিক গল্পের আভাস, আবার কোথাও একটু কাব্যের মাধুর্য, অন্য কোনোখানে আবার হয়তো-বা হাস্যপরিহাসের আলিম্পন। নানা খণ্ডের বাহারি সমবায়ে এ এমন এক সৃষ্টি যার কোনো ধরাবাঁধা বা নিশ্চিত কোনো লক্ষ্য নেই। প্রগলভতা ও চাপল্যের খানিক বৈঠকি চালে তা দিব্যি জমে ওঠে।

সৈয়দ মুজতবা আলীর রম্যরচনা

বাংলা-সাহিত্যে বাংলা কথা বলার সহজ, সরস, মজলিশি ভঙ্গিতে রম্যরচনার অনবদ্য রূপকার সৈয়দ মুজতবা আলী (১৩ সেপ্টেম্বর ১৯০৪ - ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪)। ভাষা ও ভঙ্গির রম্যতায় অত্যন্ত সাধারণ বিষয়ও তার কলমে অসাধারণ হয়ে উঠেছে। সৈয়দ মুজতবা আলীর পূর্বসূরিদের মধ্যে বিশিষ্টতম রম্যরচয়িতা সম্ভবত প্রমথ চৌধুরী (১৯৬৮-১৯৪৮)। শাণিত উইট-এর খরদীপ্তিতে প্রমথ চৌধুরী সৃষ্টি করেছিলেন এক রুচিসম্মত, মূলত বক্রোক্তিনির্ভর রম্যগদ্য। প্রমথ চৌধুরীর কথ্যরীতির সুতীক্ষ্ণ সরসতার ধারাটিই প্রাধান্য পেয়েছিল উত্তরকালের সৈয়দ মুজতবা আলীর রচনায়। তিনি ছিলেন একাধারে শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক, ভ্রমণপিপাসু, পণ্ডিত ব্যক্তিত্ব এবং বহুভাষাবিদ। এরও বাইরে তিনি ঔপন্যাসিক, ছোটগল্পকার, অনুবাদক এবং মূলত রম্যরচয়িতা। বাঙালি, ভারতীয় এবং পাকিস্তানি— এই তিনটি জাতীয়তা বহন করেছেন একইসঙ্গে। ভ্রমণসাহিত্য এবং রম্যরচনা-বাংলা সাহিত্যের এই দুইটি ধারা তারই করস্পর্শে এক নতুন ও অনন্য রূপলাভ করেছে।

তিনি শান্তিনিকেতনে (বিশ্বভারতী) পড়ার সময় থেকেই লেখালেখি করতেন। ‘সত্যপীর’, ‘ওমর খৈয়াম’, ‘টেকচাঁদ’, ‘প্রিয়দর্শী’ প্রভৃতি ছদ্মনামে তিনি বিভিন্ন পত্রিকা যেমন- ‘দেশ’, ‘মোহাম্মদী’, ‘সত্যযুগ’, ‘আনন্দবাজার’, ‘বসুমতী’-তে কলাম লিখতেন। অধ্যাপনা পেশায় নিয়োজিত ছিলেন জীবনের অনেকগুলো বছর। অধ্যাপনা ও চাকরিসূত্রে সৈয়দ মুজতবা আলীর ওঠাবসা-চলাফেরা হতো শিক্ষাবিভাগ ও দূতাবাসের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন রাশভারী লোকজনদের সঙ্গে।

তিনি নিজেও ব্যক্তিজীবনে ছিলেন অত্যন্ত শিক্ষানুরাগী এবং ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। তথাপি এতো রসবোধ ও রসিক মনোভাবসম্পন্ন সাহিত্য যে কী করে রচনা করেছেন তা ভেবে আশ্চর্য না হয়ে পারি না! রবীন্দ্রযুগে খোদ রবীন্দ্রানুসারী হয়েও এতোটা অনন্যতা আর কোনো সাহিত্যিকের মধ্যে খুব একটা চোখে পড়ে না। পড়াশোনা ও চাকরিসূত্রে বিভিন্ন দেশ যেমন- ভারত, জার্মানি, আফগানিস্তান, মিশরে বসবাস করেছেন। ফলশ্রুতিতে উপন্যাস, ছোটগল্প ছাড়াও বিভিন্ন দেশে ভ্রমণের কাহিনীগুলো তার লেখনীতে উঠে এসেছে। অগাধ পাণ্ডিত্য এবং সূক্ষ্ম রসবোধ এই দুইয়ের এক আশ্চর্য মেলবন্ধন সৈয়দ মুজতবা আলীর সাহিত্য। তার লেখার প্রধান বিশেষত্ব হলো, তিনি বাস্তবজীবনের নিরেট অভিজ্ঞতালব্ধ ঘটনাগুলোকে রসিয়ে রসিয়ে কাহিনীর মতো করে অনর্গল বর্ণনা করে যেতেন। বিভিন্ন দেশের ইতিহাস, মানুষ ও জীবন, সমাজ, রাজনীতি, জীবনপ্রণালীর রীতিনীতি থেকে শুরু করে প্রতিটি ক্ষুদ্র বিষয়ও তিনি তার লেখায় চমৎকার রূপ দিয়েছেন। বিশ্বের প্রায় অনেক দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য কীভাবে একটির সঙ্গে অন্যটির মূলসূত্র গ্রন্থিত তাও অতি সহজ ভাষায় তিনি বর্ণনা করেছেন।

তার সাহিত্যসৃষ্টিতে ভ্রমণকাহিনীগুলোই উল্লেখযোগ্য। ‘দেশে বিদেশে’ (১৯৪৯) তার শ্রেষ্ঠ ভ্রমণকাহিনী। কাবুল ভ্রমণের কাহিনী নিয়ে তিনি এটি রচনা করেন । কলকাতা থেকে পেশোয়ার হয়ে কাবুলে যাত্রার ঘটনা দিয়ে এর কাহিনী শুরু হয়। এরপর তিনি কাবুলের বিভিন্ন মানুষজন ও তাদের রীতিনীতি ছাড়াও কাবুলে তার সঙ্গে পরিচিত হওয়া অনেক আকর্ষণীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে পরিচয়, কথোপকথন এবং দৈনন্দিন জীবনের কার্যকলাপ অত্যন্ত সূক্ষ্ম রসবোধের সঙ্গে এতে তুলে ধরেছেন। কাবুলের আগা আবদুর রহমানকে আমরা কে না চিনি? সৈয়দ মুজতবা আলীর ভ্রমণকাহিনী ‘দেশে বিদেশে’র একটি অন্যতম প্রধান চরিত্র আবদুর রহমান। আমার মনে হয় ‘দেশে বিদেশে’ ভ্রমণকাহিনীর পাঠকমাত্রই মানসচোখে এই চিত্রকল্পটি অবশ্যই দেখে থাকবেন- ‘বরফাচ্ছাদিত জনাকীর্ণ কাবুলের পথে বিশাল বপু পাঠান আবদুর রহমানের পিঠে একটা বিরাট বোঁচকা; তার পিছু পিছু ক্ষীণ বপুর বাঙালি সৈয়দ মুজতবা আলী হেঁটে হেঁটে যাচ্ছেন’!

‘দেশে বিদেশে’-কে বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ভ্রমণকাহিনী হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে। অন্য কোনো ভ্রমণকাহিনী আজ পর্যন্ত এটির মতো জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারেনি। হাস্যরসে পূর্ণ বর্ণনার আশ্চর্য সুন্দর ও চমৎকার প্রাঞ্জলতাই এর কারণ। বহুভাষাবিদ সৈয়দ মুজতবা আলী বাংলা ছাড়াও ইংরেজি, সংস্কৃত, উর্দু, হিন্দি, আরবি, ফারসি, মারাঠি, গুজরাটি, পশতু, ফরাসি, জার্মানি, গ্রিক, ইতালিয়ান ভাষায় সমান পারদর্শী ছিলেন। এ কারণে তার রচনায় বিভিন্ন ভাষার শব্দের ব্যবহার চোখে পড়ার মতো; তেমনি ‘দেশে বিদেশে’ ভ্রমণকাহিনীতে হিন্দি, উর্দু, আরবি, ফারসি, পশতু, ইংরেজি শব্দ ছাড়াও ফরাসি এমনকি রুশ শব্দও ব্যবহার করতে ছাড়েননি! অথচ রচনাটি কিছুমাত্রও এর সুবোধ্যতা হারায়নি! বিবিধ ভাষা থেকে শ্লোক ও রূপকের যথার্থ ব্যবহার, হাস্যরস সৃষ্টিতে পারদর্শিতা এবং এর মধ্য দিয়ে গভীর জীবনবোধ ফুটিয়ে তোলার আশ্চর্য ক্ষমতা তাকে বাংলা সাহিত্যে এক অনন্য মর্যাদার আসনে বসিয়েছে। ভ্রমণকাহিনী হওয়া সত্ত্বেও ‘দেশে বিদেশে’ আফগানিস্তানের ইতিহাসের একটি লিখিত দলিল। তার রম্য-রসাত্মক বর্ণনা, মানুষের সঙ্গে রসালাপ, ভ্রমণের সময় বিভিন্ন স্থানের বর্ণনার মধ্য দিয়ে আফগানিস্তানের ইতিহাস ও রাজনীতিক প্রেক্ষাপট দেখা যায়। শুধু আফগানিস্তান নয়; ভারত, ইংল্যাণ্ড, জার্মান, রাশিয়া, চীন প্রভৃতি দেশের ইতিহাস এবং তৎকালীন রাজনীতিক পরিপ্রেক্ষিত ও সম্পর্কও তিনি তুলে ধরেছেন। কাবুলে অবস্থানের শেষ পর্যায়ে আফগানিস্তানের রাজনীতিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তন শুরু হয় এবং বাচ্চায়ে সাকোর আক্রমণে বিপর্যস্ত কাবুল ত্যাগের করুণ কাহিনীর মধ্য দিয়ে শেষ হয় ‘দেশে বিদেশে’। করুণ বলছি এ কারণে, আবদুর রহমানের সঙ্গে লেখকের বিচ্ছেদ মুহূর্তটি দিয়েই কাহিনী শেষ হয়; মুহূর্তটি আদতেই হৃদয়বিদারক।

পরবর্তীতে ইউরোপ, কায়রো ও বরোদার বিভিন্ন অভিজ্ঞতা নিয়ে তার রম্য ধাঁচে লেখা ‘পঞ্চতন্ত্র’ (১৯৫২), ‘জলে-ডাঙ্গায়’-ও (১৯৫২) ও তার অন্যতম ভ্রমণকাহিনী। তার লেখা উপন্যাস- ‘অবিশ্বাস্য’ (১৯৫৪), ‘শবনম’ (১৯৬০), ‘শহরইয়ার’ (১৯৬৯) ও রম্যরচনা ‘ময়ূরকণ্ঠী’ (১৯৫২)।

বিখ্যাত ছোটগল্পগুলোর মধ্যে ‘চাচাকাহিনী’, ‘টুনি মেম’, ‘ধূপছায়া’, ‘রাজা উজির’, ‘বেঁচে থাক সর্দি-কাশি’, ‘তীর্থহীনা’, ‘পুনশ্চ’, ‘কর্ণেল’, ‘ক্যাফে-দি-জেনি’, ‘স্বয়ম্বরা’, ‘বেল তলায় দু-দুবার’, ‘রাক্ষসী’, ‘রসগোল্লা’ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। ছোটগল্পগুলোর বেশিরভাগেই পাঠককে তিনি দ্বিধায় ফেলে দেন এ কারণে যে, গল্পের চরিত্র বা ঘটনাবলী বাস্তব নাকি নিছক গল্প তা নিয়ে মনের মধ্যে একটা দোলাচল সৃষ্টি হয়। তবে প্রতিটি গল্পের কাহিনী, চরিত্র, কথোপকথন সবকিছুই তার উইট ও সূক্ষ্ম রসবোধে এমনভাবে সিক্ত যে, মোটামুটি সব বয়সী পাঠকই তার রচনার রসাস্বাদনে সক্ষম। তার লেখার ধরনই এমন যে পাঠমাত্রই অন্যরকম অনুভূতি দেয়। এখনও আমরা কথায় কথায় তার রচনার বিভিন্ন জনপ্রিয় উক্তি ব্যবহার করি; যেমন- ‘‘বই পড়ে কেউ দেউলিয়া হয় না’’, ‘‘যে ব্যামোর দেখবেন সাতান্ন রকমের ওষুধ, বুঝে নেবেন, সে রোগ ওষুধে সারে না’’ ইত্যাদি। আর তার সৃষ্ট চরিত্র ‘আবদুর রহমান’ তো এখনও সবার কাছে প্রিয়!

যশস্বী ও কিংবদন্তি সৈয়দ মুজতবা আলীর সৃষ্ট সাহিত্য সংখ্যায় সীমিত হলেও অপার সৃজনশীলতা, জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের বিশালতায় বাংলা সাহিত্য ভুবনে তার তুলনা শুধু তিনিই। এজন্য ১৯৪৯ সালে তিনি ভারত সরকার কর্তৃক ‘নরসিং দাস পুরস্কার’, ১৯৬১ সালে ‘আনন্দ পুরস্কার’ এবং ২০০৫ সালে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক মরণোত্তর ‘একুশে পদক’-এ ভূষিত

হন। তার লেখনী এপার বাংলা ও ওপার বাংলা দুইখানেই সমধিক জনপ্রিয়। অতি সাধারণ পরিবেশন ভঙ্গি তার লেখাকে অসাধারণ মাত্রা দিয়েছে। জ্ঞানাপিপাসু মনের নয় সৈয়দ মুজতবা আলী পাঠকের আনন্দপিপাসু মনের খোরাক যুগিয়েছেন। সুতীক্ষ্ণ অথচ সরস রম্যতাই সৈয়দ মুজতবা আলীর সাহিত্যকে আমাদের কাছে অত্যধিক রমণীয় করে তুলেছে। সিরিয়াস ধারার সাহিত্য কিংবা ভরিক্কি চালের উচ্চমার্গীয় জ্ঞানমূলক সাহিত্য আমাদের জ্ঞানতৃষ্ণা মেটায়; যেটা হয়তো ক্ষুধার খাদ্যের মতন যা না হলেই নয়; কিন্তু মনের খোরাক যোগাতে রম্যরসজারিত রচনার আবেদন ঠিক টক-ঝাল-নোনতা চটকদার রুচিবর্ধক খাবারের মতন বলতে পারি; যা ভালোলাগা অনিবার্য! সৈয়দ মুজতবা আলীর লেখা পড়ে হাসেননি এমন পাঠক আদৌ আছে কি-না সন্দেহ; আমার মনে হয়, ঘরকুনো-নিভৃতচারী বইপ্রেমী কিংবা বোদ্ধা পাঠককেও আপনমনে দুদণ্ড প্রাণ খুলে হাসতে বাধ্য করতে সৈয়দ মুজতবা আলীর রম্যরচনা পারঙ্গম!

তথ্যসূত্র : ইন্টারনেট